بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)- এর ৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মানুষ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদি যে মনোভাব নিয়ে পাঠ করে থাকে সে অনুসারেই ইতিবাচক বা নেতিবাচক ফলাফল প্রকাশ পায়। এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার একটি ঘটনা মনে পড়ে যা থেকে বুঝা যায় ডিবেটিং সোসাইটি যে-ই বিতর্ক সভা করে এতে অনর্থক এক বক্তা একটা বিষয়ের পক্ষে বলে আর দ্বিতীয় বক্তা বিপক্ষে বলে থাকে। এর ফলে অনেক সময় মানুষের চিন্তাধারা প্রভাবিত হয় কেননা, বক্তা যেই হোক না কেন সে কেবল বিতর্কের খাতিরেই কথা বলে থাকে, হৃদয়ে যা আছে তা বলে না বরং সেখানে প্রতিযোগিতাই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যাহোক, তিনি এ সম্পর্কে বলেন, এটি অনেক সময় ঈমানের জন্য হানিকর হয়ে থাকে। তিনি আরো বলেন, মৌলভী মোহাম্মদ আহসান আমরোহী সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলেছেন, মৌলভী বশীর আহমদ সাহেব মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ঘোর সমর্থক ছিলেন আর আমি ছিলাম চরম বিরোধী। মৌলভী বশীর সাহেব সব সময় অন্যদের বারাহীনে আহমদীয়া পাঠের উপদেশ দিতেন আর বলতেন, যিনি এই বই লিখেছেন তিনি মুজাদ্দিদ। তিনি বলেন, অবশেষে আমি তাকে বললাম, অর্থাৎ মৌলভী মোহাম্মদ আহসান সাহেব বশীর সাহেবকে বলেন, চলুন তিনি মুজাদ্দিদ কি মুজাদ্দিদ নন এ বিষয়ে বিতর্ক করি। কিন্তু বিতর্ক কীভাবে হবে? আপনি যেহেতু তার সমর্থনকারী তাই আপনি বিরোধী মনোভাব নিয়ে তাঁর বই-পুস্তক পাঠ করুন। আর আমি যেহেতু বিরোধী তাই আমি সমর্থকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বই-পুস্তক পাঠ করব। আর এই পুস্তক পাঠের জন্য সাত-আট দিন নির্ধারিত হয়। উভয়ে বই-পুস্তক পাঠ করেন। মৌলভী আহসান সাহেব বলেন, এর ফলাফল যা দাঁড়িয়েছে তাহলো, আমি যে বিরোধী ছিলাম— আহমদী হয়ে যাই। আর যে আহমদীয়াতের খুবই নিকটে অবস্থান করছিল সে অনেক দূরে চলে যায়। মৌলভী আহসান সাহেবের সামনে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় আর বশীর সাহেবের হৃদয় থেকে ঈমান লোপ পেতে থাকে।

এ সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মনস্তত্ত্ববিদ্যার দৃষ্টিকোন থেকে ডিবেট বা বিতর্ক অত্যন্ত ক্ষতিকর আর অনেক সময় তা ভয়াবহ ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। এগুলো এমন সূক্ষ্ম বিষয় যা বোঝার যোগ্যতা সকল শিক্ষকের নেই বা সকল পাঠকের নেই। তাই ভাল কথা থেকেও কেউ যদি সমালোচনা বা আপত্তির দৃষ্টিকোন থেকে কথা বের করার চেষ্টা করে তাহলে তা স্খলনের কারণ হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদি সম্পর্কে অনেকেই আপত্তি করে থাকে; তারা বলে, আমরা পড়েছি এ কথা লেখা আছে, সে কথা লেখা আছে। এর মূল কারণ হলো, আপত্তি করার উদ্দেশ্যেই তারা পড়ে। এছাড়া প্রসঙ্গও দেখে না যে, কোন প্রসঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। তাই এটি নতুন কোন বিষয় নয়। আপত্তিকারীরা আল্লাহ্ তা'লার কালাম বা কুরআনেও আপত্তিকর কথা খুঁজে বের করে। এ কারণেই পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেছেন, এটি মু'মিনদের জন্য নিরাময় এবং রহমতের কারণ বা আশীর্বাদ। কিন্তু আপত্তিকারী যারা আছে, যারা যালেম ও সীমালঙ্ঘনকারী তাদেরকে এটি ক্ষতির মুখে ঠেলে দেয়। তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে থাকে, আল্লাহ্ তা'লার সত্তা সম্পর্কে আরও বেশি আপত্তি করা আরম্ভ করে, ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপত্তি করা আরম্ভ করে। অতএব, আল্লাহ্‌র বাণী বা কুরআনই হোক না কেন তা ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণকর হয় না যতক্ষণ না তা পবিত্র হৃদয় নিয়ে পাঠের চেষ্টা করা হয় ।

এরপর নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ঘটনা শোনান। তিনি বলেন, একবার তিনি (আ.) কোন মামলায় হাজিরার জন্য যান, আর কোর্টে কেস পেশ হতে বিলম্ব হয়ে যায়। ইত্যবসরে নামাযের সময় হয়ে যায়। মানুষের নিষেধাজ্ঞা স্বত্ত্বেও তিনি নামায পড়তে চলে যান। যাওয়ার পরপরই কোর্টে হাজিরার জন্য তাঁকে ডাকা হয় কিন্তু তিনি ইবাদতে রত ছিলেন। ইবাদত শেষ হওয়ার পর তিনি আদালত কক্ষে আসেন। সরকারী বা আদালতের রীতি অনুসারে তাঁর বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেটের এক তরফা ডিক্রি জারী করার কথা কিন্তু তাঁর এই কাজ আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে খুবই পছন্দনীয় ছিল। তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করেন যে, ইনি ইবাদত করছেন, নামায পড়ছেন। তিনি তাঁর অনুপস্থিতিকে আমলে না নিয়ে তাঁর পক্ষে বা তাঁর পিতার পক্ষে রায় প্রদান করেন। তাঁর নিজের ব্যক্তিগত কোন মামলা-মোকদ্দমা ছিল না, সম্পত্তির মামলায় বাধ্য হয়ে যেতে হলেও পিতার পিড়াপিড়িতেই তিনি যেতেন।

অপর এক জায়গায় পুনরায় বা-জামা'ত নামাযের গুরুত্ব এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রীতি সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আমাদের কীভাবে বা-জামা'ত নামাযের অভ্যাস করা উচিত সে সম্পর্কে বলেন, বা-জামা'ত নামাযের আরো

একটি রীতি হলো, স্ত্রী-সন্তানদের সাথে নিয়ে বা-জামা'ত নামায পড়া। অভ্যাস না থাকার কারণে বা-জামা'ত নামাযের গুরুত্ব মানুষের হৃদয় থেকে হারিয়ে গেছে। যেহেতু বা-জামা'ত নামাযের অভ্যাস নেই তাই ধারণাই নেই যে, জামাতবদ্ধ হয়ে নামায পড়ার গুরুত্ব কত অপরিসীম। এই অভ্যাস পরিত্যাগ করে অর্থাৎ একা নামায পড়ার অভ্যাস ছেড়ে দিয়ে বা-জামা'ত বা জামাতবদ্ধভাবে নামায পড়ার অভ্যাস করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন নামাযের জন্য মসজিদে যেতে পারতেন না তখন ঘরেই বা-জামা'ত নামায পড়াতেন। কোন বাধ্য-বাধকতার বশবর্তী হয়ে তিনি পৃথক বা একা নামায খুব বিরলই পড়তেন। প্রায়সময় আমাদের মাকে সাথে নিয়ে তিনি জামা'ত করাতেন বা জামা'তে নামায পড়াতেন। আম্মার সাথে অন্যান্য মহিলারাও যোগ দিতেন। তাই প্রধানঃত বন্ধুদের সর্বত্র জামা'তের সাথে বা জামাতবদ্ধভাবে নামায পড়া উচিত। যার এই সুযোগ নেই তার উচিত নিজের সন্তান-সন্ততিদের সাথে নিয়ে বা-জামা'ত নামায পড়া। সর্বত্র বন্ধুদের বা-জামা'ত নামাযের ব্যবস্থা নেয়া উচিত। যেখানে শহর বড়, মানুষের বসবাস দূরে-দূরে সেখানে পাড়ায়-পাড়ায় বা-জামা'ত নামাযের ব্যবস্থা করা উচিত। যেখানে মসজিদ নেই সেখানে মসজিদ নির্মাণের চেষ্টা করা উচিত।

যাহোক, বা-জামা'ত নামাযের গুরুত্ব হলো, যদি ঘরেও থাকেন সন্তান-সন্ততিকে সাথে নিয়ে নামায পড়বেন যেন বাচ্চাদের মাঝে বা-জামা'ত নামায সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে উঠে।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই কথার ওপর জোর তাগিদ দিয়েছেন যে, 'নামায' এর সকল শর্তের নিরিখে পড়া উচিত। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, সকল শর্তাবলী বা নিয়ম-কানুন সামনে রেখে নামায পড়া খুবই আকর্ষণীয় একটি কাজ। কিন্তু আমরা যদি নিজেদের উদাসীনতা এবং বুদ্ধির অভাবে এটিকে সঙ্কুচিত করি বা এর ডালপালা কাটতে থাকি তাহলে এটি অলাভজনক এবং বৃথা কাজে পর্যবসিত হয়। নামাযের সৌন্দর্য এটিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে পড়ার মাঝে। কিন্তু এটি যদি সাজিয়ে-গুছিয়ে পড়া না হয় তাহলে এটি বৃথা কাজে পর্যবসিত হয়। আর এমন নামায কখনও কল্যাণকর হতে পারে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, মোরগ যেভাবে ঠোকর মেরে মাটি থেকে শস্যদানা সংগ্রহ করে মানুষ সেভাবে নামায পড়ে। এমন নামায অবশ্যই কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না বরং অনেক সময় তা অভিশাপ ডেকে আনে।

একবার কেউ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর কাছে অভিযোগ করে যে, আমাদের অধীনস্তরা আমাদেরকে সালাম করে না বা ছোটরা জ্যেষ্ঠদের সালাম করে না। তিনি উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, সালামের নির্দেশ উভয়ের জন্য সমান। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেছেন, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে একটি

পঙক্তি শুনেছি, ‘হে মীর! যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলোরে, কি-বা হানি হবে এতে তোমার মহিমার’। তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ যদি কোন এক ভাই না মানে তাহলে আমরা নিজেরা কেন তা মেনে চলব না? অতএব যদি অভিযোগ সত্য হয় তাহলে এটি অযৌক্তিক কাজ বা নৈতিকতা বিবর্জিত কাজ। কোথাও এ নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, শুধু ছোটরা সালাম করবে, বড়রা করবে না। যদি অধীনস্ত সালাম না করে তাহলে অফিসার বা কর্মকর্তাদের উচিত প্রথমে সালাম করা । তিনি বলেন, আমার রীতি হলো, আমার যখন মনে থাকে প্রথমে আমি নিজেই সালাম দেই। অনেক সময় যখন মনে থাকে না তখন অন্য কেউ প্রথমে সালাম করে। তিনি আরো বলেছেন, এমন ক্ষেত্রে নাযেরদের আপত্তি না করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত।

আমাদের সকল কর্মকর্তার তা সে যে পর্যায়েরই হোক না কেন, প্রথমে সালাম করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত। ছোট বা অধীনস্ত আমাকে প্রথমে সালাম করুক— এ অপেক্ষায় থাকা উচিত নয়।

অনেক জ্যেষ্ঠ বা ওহ্‌দাদার তথা পদাধীকারী এমন আছে যারা খুব কমই সালামের উত্তর দিয়ে থাকে। আমার কাছে এমন অভিযোগও আসে। কর্মকর্তাদের যদি অভিযোগ থেকে থাকে তাহলে অধীনস্তদেরও অভিযোগ রয়েছে, এরা সালামের উত্তর দেয় না। বা এত ক্ষীণস্বরে উত্তর দেয় যে, বোঝা-ই যায় না। বা এমন অবজ্ঞার সাথে উত্তর দেয় যে, মনে হয় তাদের ঘাড়ে কোন বোঝা চাপানো হয়েছে। যাহোক, জামা’তের সকল শ্রেণীর মাঝে সালামের প্রচলন হওয়া উচিত আর এটি হাদীসও বটে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে মানুষ কীভাবে তাঁর বিরোধিতা করত এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, ১৮৯৭ সনের অক্টোবর মাসে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তাঁকে মুলতান যেতে হয়েছে। সাক্ষ্য দেওয়ার পর ফিরে আসার পথে তিনি কিছুদিন লাহোরেও অবস্থান করেন। সেখানে যে গলি-ই তিনি অতিক্রম করতেন, মানুষ তাঁকে গালি দিত আর তাঁর নাম নিয়ে নোংরা শব্দ ব্যবহার করত, অপলাপ করত। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তখন আমার বয়স ছিল আট বছর আর এই সফরে আমিও তাঁর সফরসঙ্গী ছিলাম। তাঁর প্রতি মানুষের এই বিরোধিতার কারণ আমার বোধগম্য ছিল না। তাই এটি দেখে আমি বিস্মিত হতাম, যেই পথ-ই তিনি অতিক্রম করেন মানুষ কেন তাঁর পেছনে পেছনে তালি বাজায়, শীষ দেয়? আমার মনে আছে এক হাত কাটা ব্যক্তি যার এক হাত কাটা ছিল আর দ্বিতীয় হাতে বাঁধা ছিল কাপড়; জানা নেই, সেটা হাত কাটার ক্ষত ছিল নাকি নতুন কোন ক্ষত। যাহোক, তার সেই হাত ছিল ক্ষতযুক্ত। সেও মানুষের সাথে যোগ দিয়ে খুব সম্ভব ওজীর খান মসজিদের সিড়িতে দাঁড়িয়ে তালি বাজাচ্ছিল আর নিজের কাটা হাত দ্বিতীয় হাতের ওপর মারছিল। অন্যদের দলে যোগ দিয়ে সেও হৈচৈ করছিল, হায় হায় মির্যা প্রতিযোগিতার ময়দান থেকে পালিয়ে গেছে, নাউযুবিল্লাহ্। আর আমি এ দৃশ্য দেখে

অবাক হচ্ছিলাম, বিশেষ করে সেই ব্যক্তির জন্য যার হাতও নেই তারপরও সে তালি বাজানোর চেষ্টা করছিল। দীর্ঘক্ষণ আমি গাড়ি থেকে মাথা বের করে সেই ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে ছিলাম। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লাহোর থেকে কাদিয়ান ফিরে আসেন।

একটি মোকদ্দমায় ম্যাজিস্ট্রেটের দৃঢ় সংকল্প ছিল বরং তার কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল যে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে। এ ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) প্রথমে অবতরণিকা হিসেবে কিছু কথা বলার পর এক জায়গায় বলেন, একবার মহানবী (সা.) মুসলমানদের আদমশুমারি করান। তাদের মোট সংখ্যা ছিল সাতশত। সাহাবীগণ ভাবলেন, মহানবী (সা.)-এর আদমশুমারি করানোর কারণ হলো এই আশঙ্কা যে, শত্রু কোথাও আমাদের ধ্বংস না করে দেয়। সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এখনতো আমাদের সংখ্যা সাতশত; এখনও কি এটি ভাবা যেতে পারে যে, কেউ আমাদের ধ্বংস করতে পারবে? কত মহান ঈমান ছিল তাঁদের। সাতশত হওয়ার কারণে তাঁরা ভাবতেই পারতেন না যে, শত্রু তাদেরকে ধ্বংস করতে পারবে। এ ঘটনা বর্ণনার পর তিনি (রা.) বলেন, ঈমানী শক্তি অনেক বড় শক্তি হয়ে থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ঘটনা, একবার তিনি গুরুদাসপুরে ছিলেন। আমিও গুরুদাসপুরে ছিলাম কিন্তু ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম না যেখানে এ ঘটনা ঘটেছে। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এমন এক বন্ধু আমাকে শুনিয়েছেন, খাজা কামাল উদ্দিন সাহেব এবং আরো কয়েকজন আহমদী ভীত-ত্রস্ত ও হন্ত-দন্ত হয়ে তিনি (আ.)-এর কাছে আসেন এবং বলেন, অমুক ম্যাজিস্ট্রেট যার আদালতে মামলা রয়েছে, সে লাহোর গিয়েছিল। আর্যরা তার ওপর চাপ প্রয়োগ করে, মির্যা সাহেব আমাদের ধর্মের চরম বিরোধী। একদিনের জন্য হলেও তাঁকে অবশ্যই শাস্তি দাও; এটি তোমার জাতিগত খিদমত বা সেবা হবে। আর সে তাদের সাথে এই অঙ্গীকার করেছে যে, আমি অবশ্যই শাস্তি দিব।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একথা শোনার সময় শায়িত ছিলেন। শোনার পর একপাশে কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে বলেন, খাজা সাহেব! এ আপনি কেমন কথা বলছেন? কেউ খোদার সিংহের গায়ে হাত দিতে পারে কি? আল্লাহ্ তা'লা এই ম্যাজিস্ট্রেটকে যে শাস্তি দিয়েছেন তাহলো, প্রথমে গুরুদাসপুর থেকে তার বদলি হয়ে যায়, এরপর তার ডিমোশন বা অবনতি হয়। তাকে ই.এস.ই থেকে মুনসেফ বানিয়ে দেয়া হয়। তারপর (এই মামলার) রায়ও প্রদান করেছে আরেকজন মুনসেফ। তাই ঈমানী শক্তি অসাধারণ এক শক্তি কেউ এর সামনে দাঁড়াতে পারে না।

তাই জামাতে যোগদানকারীদের মাঝে যদি ঈমান ও নিষ্ঠা সৃষ্টি হয় তবেন নতুন লোকদের যোগ দেয়া কল্যাণকর হতে পারে। শুধু সংখ্যা বৃদ্ধি আনন্দের কারণ হওয়া উচিত নয়। যদি কারো ঘরে দশ সের দুধ থাকে আর সে এর সাথে দশ সের পানি যোগ

করে, তাহলে এ ভেবে আনন্দিত হতে পারে না যে, তার দুধ এখন বিশ সের হয়ে গেছে। দুধ বৃদ্ধি করাই আনন্দের বিষয় হতে পারে। দুধের ভেতর দুধ ঢেলে বৃদ্ধি করার মাঝেই কল্যাণ নিহিত।

তাই নতুন হোক বা পুরাতন আমাদেরকে ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি করার চেষ্টা করা উচিত। সাতশত লোকের ঈমান এমন ছিল, প্রত্যাম এত দৃঢ় ছিল যে পৃথিবীর কেউ আমাদের পরাজিত করতে পারে না আর পৃথিবী দেখেছে কেউ তাদের পরাজিত করতে পারেনি।

একই মোকদ্দমা সম্পর্কে আরো এক জায়গায় তিনি (রা.) বলেন, খাজা কামাল উদ্দিন সাহেবের অভ্যাস ছিল দীর্ঘ কথা বলা। তিনি বলেন, হুযূর! ম্যাজিস্ট্রেট অবশ্যই গ্রেফতার করবে, শাস্তি দিবে। বিপক্ষ দলের সাথে মিমাংসা করাই শ্রেয় হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে বলেন, খাজা সাহেব! আল্লাহ্‌র সিংহের গায়ে হাত দেয়া সহজ কথা নয়। আমি খোদা তা'লার সিংহ, আমার গায়ে হাত দিয়ে তো দেখুক, আর এমনটিই হয়েছে। দুই ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে যে ব্যক্তি সেই মামলার রায় দেয়ার জন্য নিযুক্ত হয় তার এক ছেলে পাগল হয়ে যায়। তার স্ত্রী যদিও মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লার প্রত্যাদিষ্ট হিসেবে মানত না কিন্তু তাকে চিঠিতে লিখেছে, তুমি এক মুসলমান দরবেশকে অসম্মান করেছ। এর পরিণামে এক ছেলে পাগল হয়ে গেছে। এখন দ্বিতীয় ছেলের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যাও। সেই ম্যাজিস্ট্রেট যেহেতু শিক্ষিত ছিল সে বলল, আমার স্ত্রী কেমন অজ্ঞতাপ্রসূত কথা বলছে। এমন কথায় তার কোন বিশ্বাস ছিল না। এদিকে সে কোন কর্ণপাত করেনি। ফলাফল যা দাঁড়িয়েছে তাহলো, তার দ্বিতীয় পুত্র নদীতে ডুবে মারা যায়। সে রাবী নদীতে গোসল করতে গিয়েছিল। তখন কুমির তার পায়ে কামড় দেয় আর এভাবে তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়। সেই ম্যাজিস্ট্রেট হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এত কষ্ট দিত যে, শুনানির পুরো সময় মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দাঁড় করিয়ে রাখত। পানির প্রয়োজন অনুভব হলে সে পানি পান করারও অনুমতি দিত না। একবার খাজা সাহেব পানি পান করার অনুমতি চান, কিন্তু সে অনুমতি দেয়নি।

এরপর এক দ্বিতীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এই কেস যায়, সেও সাসপেন্ড হয়ে যায়, যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। যাহোক, এরা ভয়াবহ যুলুম এবং অন্যায়ে প্রবৃত্ত ছিল আর তারা এর পরিণামও দেখেছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, একবার আমি দিল্লী যাচ্ছিলাম। এই ম্যাজিস্ট্রেটের পরিণাম সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, যে ম্যাজিস্ট্রেট হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে এই দুর্ব্যবহার করেছে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর সাথে লুধিয়ানা স্টেশনে তার দেখা হয়। বড় আকুতি-মিনতির সাথে বেদনাবিধুর কণ্ঠে সে বলে, দোয়া করুন! আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাকে ধৈর্যশক্তি দেন। আমি অনেক বড় বড় ভুল করেছি। আমার আশঙ্কা হয়, কোথাও আমি

পাগল না হয়ে যাই- এহলো আমার অবস্থা। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এগুলো সেসব সুস্পষ্ট নিদর্শন যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় নবীদের সত্যতা পৃথিবীতে প্রকাশ করে থাকেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি ঘটনা শোনাতেন। একবার রুস্তমের ঘরে চোর ঢুকে। রুস্তম নিঃসন্দেহে অনেক বড় বীর ছিল, কিন্তু তার খ্যাতি ছিল যুদ্ধ কৌশলের জন্য। যুদ্ধে পারদর্শী ছিল, তরবারি চালানোর দক্ষতা ছিল তার কিন্তু কুস্তী বা মল্লযুদ্ধে সবার দক্ষ হওয়া আবশ্যক নয়। যে যুদ্ধে পারদর্শী সে মল্লযুদ্ধেও দক্ষ হবে এমনটি আবশ্যক নয়। যাহোক, চোর আসলে সে চোর ধরার চেষ্টা করে। সেই চোর মল্লযুদ্ধ বা কুস্তী জানত। সে রুস্তমকে ধরাশায়ী করে। রুস্তম যখন দেখল, আমি এখন মারা পড়বো তখন সে বলে উঠল, রুস্তম এসে গেছে। চোর একথা শুনতেই তৎক্ষণাৎ তাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। বস্তুতঃ চোর রুস্তমের সাথেই কুস্তি লড়ছিল এবং তাকে ধরাশায়ীও করে ফেলেছিল কিন্তু রুস্তমের নাম শুনে সে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এ দৃষ্টিকোন থেকে তিনি নসীহত করেন যে, অনেক সময় অনেকে এমন গুজব ছড়ায় যারফলে মানুষের মনোবল ভেঙ্গে যায়। তিনি বলেন, মানুষের ঘরে আগুন লাগলে সে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে, মানুষের ওপর এর ততটা প্রভাব পড়েনা যতটা না নিজের অনুপস্থিতিতে তার ঘরে আগুন লাগার সংবাদে সে প্রভাবিত হয়।

তিনি আরো বলেন, যুদ্ধের পরিস্থিতিতে বোমাবর্ষণের গুজব যতটা ত্রাস সৃষ্টি করে সত্যিকার বোমাবর্ষণ ততটা ভীতি সৃষ্টি করে না। ভিত্তিহীন গুজব অনেক সময় জাতির হৃদয়ে ভীরুতা সৃষ্টি করে। তাই নিজেদের বীরত্ব এবং সাহসিকতা ধরে রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, গুজব ছড়াতে না দেয়া এবং এর মোকাবিলা করা। রুস্তমকে চোর ধরাশায়ী করে ঠিকই কিন্তু তার নামের একটা ত্রাস এবং ভীতি ছিল, তাই নাম শোনামাত্রই সে ভয় পায় এবং পালিয়ে যায়। একইভাবে অনেক সময় গুজব পরিবেশে অনর্থক ভীতি এবং ত্রাস সঞ্চার করে। তাই সবসময় গুজবও এড়িয়ে চলা উচিত আর এমন পরিস্থিতি যদি দেখা দেয়-ই তাহলে সাহসিকতা প্রদর্শন করা উচিত।

করমদ্বীন সংক্রান্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ১৯০২ সনের শেষের দিকে করমদ্বীন নামক এক ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে মানহানীর মামলা করে আর জেহ্লামের আদালতে হাজিরা দেয়ার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে সমন জারী করা হয়। তিনি ১৯০২ সনের জানুয়ারী মাসে সেখানে যান। তার ধারাবাহিক সফলতার এটি প্রথম নিদর্শন ছিল।

যদিও তিনি ফৌজদারী মামলার উত্তর দেয়ার জন্য যাচ্ছিলেন কিন্তু তা স্বত্ত্বেও মানুষের ভিড় ছিল কল্পনাতীত। যখন তিনি জেহ্লাম স্টেশনে গাড়ি হতে নামেন তখন এত বিশাল জনসমুদ্র ছিল যে, প্ল্যাটফর্মে পা রাখার মত জায়গাও ছিল না। বরং স্টেশনের

বাইরে ডানে এবং বামে রাস্তার ওপর মানুষের ভিড়ের কারণে গাড়ি চলাচলও ব্যহত হচ্ছিল। জেলার কর্মকর্তাদের তখন বিশেষ ব্যবস্থা হাতে নিতে হয়েছে। তহশীলদার গোলাম হায়দার সাহেবকে সেখানে বিশেষ দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়। তিনি হযরত সাহেবের সাথে বড় কষ্টে রাস্তা খালি করে গাড়ি নিয়ে যান। শহর পর্যন্ত বরাবর মানুষের ভিড়ের কারণে রাস্তা খালি পাওয়া কঠিন ছিল। শহরবাসী ছাড়াও সহস্র সহস্র মানুষ গ্রাম থেকেও তাঁর দর্শন লাভের জন্য এসেছিল। প্রায় একহাজার মানুষ সেখানে বয়আত করেন। তিনি যখন আদালতে হাজিরা দিতে যান তখন এতবেশি মানুষ মামলার কার্যক্রম শোনার জন্য উপস্থিত ছিল যে, আদালতের জন্য ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে পড়ে। মাঠে বহুদূর পর্যন্ত মানুষের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়। প্রথম হাজিরাতেই তিনি নির্দোষ খালাশ পেয়ে যান এবং তিনি মঙ্গলজনকভাবে ফিরে আসেন।

যাহোক, এরপর যেমনটি তিনি উল্লেখ করেছেন, সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া আরম্ভ হয়। ১৯০৩ সন থেকে তাঁর বা জামাতের আশ্চর্যজনকভাবে উন্নতি হতে থাকে। অনেক সময় এক দিনেই পাঁচশ'য়ের মত মানুষ বয়আতের চিঠি প্রেরণ করত। তাঁর অনুসারীরা সংখ্যায় সহস্র সহস্র বরং কয়েক লক্ষে উপনীত হয়। সকল শ্রেণীর মানুষ তাঁর হাতে বয়আত করে আর এই জামা'ত ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করতে থাকে। তাঁর জীবদ্দশায় পাঞ্জাবের সীমানা পেরিয়ে অন্যান্য প্রদেশে বরং বহির্দেশেও জামাত বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা অবমাননা এবং অসম্মানের শাস্তি কীভাবে দেন সে সংক্রান্ত ম্যাজিস্ট্রেটের ঘটনা আপনারা শুনেছেন। আরো একটি ঘটনা তিনি (রা.) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার আমরা লক্ষ্ণৌ যাই। সেখানে সীমান্ত প্রদেশের এক মৌলভী আব্দুল করীম ছিল, যে আমাদের জামাতের ঘোর বিরোধী ছিল। সে আমাদের আসার পরে একটি বক্তৃতা দেয় এবং এতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ঘটনা খুবই তাচ্ছিল্যের সাথে উপস্থাপন করে। প্রকৃত ঘটনাটি হলো, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দিল্লী গমন করেন। সেখানে আমাদের এক আত্মীয়-সম্পর্কের মামা ছিলেন যার নাম মির্যা হায়রাত দেহ্লবী। তার মাথায় একদিন দুষ্টুমি খেলে। সে নকল পুলিশ ইন্সপেক্টর সেজে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে ভয় দেখানোর জন্য বলে, আমি পুলিশ ইন্সপেক্টর, আমাকে সরকারের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে আপনাকে এই নোটিশ দেয়ার জন্য যে, আপনি এক্ষুনি এই স্থান ত্যাগ করুন নতুবা আপনার ক্ষতি হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার প্রতি কর্ণপাত-ই করেননি। কিন্তু কতিপয় বন্ধু তদন্ত করে দেখতে চান যে, এ ব্যক্তি কে? তখন সে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এই ঘটনাটি সীমান্ত প্রদেশের এই অ-আহমদী মৌলভী আব্দুল করীম এভাবে বর্ণনা করেছে যে, দেখ আল্লাহ্র নবী সাজে। সে দিল্লী গিয়েছিল আর মির্যা হায়রাত পুলিশের ইন্সপেক্টর সেজে তার কাছে চলে যায়। সে ঘরের ওপরের তলায় বসেছিল। অথচ এ কথাটিও সম্পূর্ণরূপে

মিথ্যা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তখন নীচে বাড়ির উঠানে বসেছিলেন। যাহোক, সেই মৌলভী আব্দুল করীম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে বলে, সে যখন শুনল যে, পুলিশের ইন্সপেক্টর এসেছে তখন সে এতটাই ভয় পায় যে, সিড়ি থেকে নামার সময় তার পা পিছলে যায় এবং সে হুমড়ি খেয়ে নীচে পড়ে যায়। মানুষ এ বক্তৃতা শুনে গলা ফাটিয়ে অট্টহাসি হাসে। কিন্তু ঘটনা কী ঘটেছে এরপর, আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে শাস্তি দেন তা দেখুন! একই রাতে মৌলভী আব্দুল করীমকে আল্লাহ্ তা'লা ধৃত করেন। সে ঘরের ছাদে ঘুমন্ত ছিল। রাতে কোন কাজের জন্য তাকে উঠতে হয়। সেই ছাদের যেহেতু কোন রেলিং ছিল না বা কিনারায় ইটের কোন দেয়াল ছিল না আর ঘুমের কারণে তার চোখ বন্ধ ছিল তাই তার এক পা ছাদ থেকে ফসকে যায় আর সে ধড়াস করে নীচে পড়ে যায় এবং অকুস্থলেই পটল তুলে। তিনি (রা.) বলেন, দেখ যদি সে অদৃশ্য সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জ্ঞাত থাকত যে, আমি অবমাননার এই শাস্তি পাব তাহলে সে কখনো অসম্মানজনক আচরণ প্রদর্শন করত না বরং তাঁর প্রতি ঈমান আনত। যদিও এমন ঈমান তার কোন কাজে আসত না কেননা অদৃশ্যের পর্দাই যদি উঠে যায় তাহলে ঈমান আনায় লাভ কি? সত্যিকার অর্থে ঈমান তখনই প্রকৃত ঈমান হয়ে থাকে যখন অদৃশ্যে ঈমান থাকে। সেই ঈমানই কাজে আসে বা কাজে লাগে যা অদৃশ্যের প্রতি আনা হয়। প্রতিদান বা পুরস্কার সামনে দেখে সবাই ঈমান আনতে পারে। যাহোক, এ থেকে তার পরিণাম যারা দেখেছে তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আল্লাহ্‌র নবীদের সাথে তিরস্কারের পরিণাম কী হয়ে থাকে।

আজকাল যারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি বিদ্রুপাত্মক আচরণ করে বা অপলাপ করে (তাদের জানা উচিত) তিনি (সা.) ছিলেন খোদা তা'লার সবচেয়ে প্রিয় নবী। তাঁর সম্পর্কে মানুষের অপলাপকে আল্লাহ্ তা'লা এমনিতেই ছেড়ে দেবেন? না বরং আল্লাহ্ তা'লা এমন মানুষকে পৃথিবীতেও শিক্ষণীয় নিদর্শনে পরিণত করেন। তাই এমন লোকদের চিকিৎসা মুসলমানদেরকে হাত বা বন্দুক বা রাইফেল দিয়ে নয় বরং দোয়ার মাধ্যমে করা উচিত। কিন্তু এরও যথাযথ উপলব্ধি কেবল আহমদীদেরই রয়েছে। তাই আমি যেমনটি বলেছি, আমাদের উচিত আমাদের ব্যথা-বেদনাকে দোয়ায় রূপ দেয়া আর এদিনগুলোতে বিশেষভাবে দোয়া করা উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে আরো বলেন, অর্থাৎ পূর্বে যে মৌলভীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তার সাথে এটি সম্পর্কযুক্ত। তিনি বলেন, অনেকে এমন ছিল যারা বলত মির্যা সাহেব কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হবেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেই কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত করেছেন। অনেকে বলত, মির্যা সাহেব প্লেগের শিকার হবেন; যারা এমনটি বলেছে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেই প্লেগের মাধ্যমে ধ্বংস করেছেন। যেখানে এ ধরনের সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে সেখানে আমরা আর কতকাল এগুলোকে দৈব ঘটনা আখ্যায়িত করব। তাই নিজেদের জীবনে এমন পবিত্র পরিবর্তন

আনয়ন কর যেন পৃথিবী তা অনুভব করে। তোমাদের অবস্থা এমন হওয়া উচিত, তোমাদের তাক্বওয়া, তোমাদের পবিত্রতা, তোমাদের দোয়া গৃহীত হওয়া, তোমাদের আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক দেখে যেন মানুষ এদিকে চুম্বক-আকর্ষণ বোধ করে। স্মরণ রেখ, আহমদীয়াতের উন্নতি এমন মানুষের মাধ্যমেই হবে। আর আপনারা যদি এই মর্যাদায় বা এর কাছাকাছি পৌঁছে যান তাহলে আপনারা বাইরেও যদি না আসেন এবং কোন নিভৃত কোনে বসে থাকেন তাহলে সেখানেও ইনশাআল্লাহ্‌ মানুষ আপনাদের চতুষ্পার্শে সমবেত হবে আর আহমদীয়াত গ্রহণ করবে।

আরো একটি ঘটনার তিনি উল্লেখ করেন। হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.) যখন শিয়ালকোট যান মৌলভীরা সেখানে ফতওয়া জারি করে, যে এই ব্যক্তির বক্তৃতা শুনতে যাবে তার বিবি তালাক হয়ে যাবে বা বিয়ে ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু মির্যা সাহেবের আকর্ষণ এমন দুর্বার ছিল যে, মানুষ এই ফতওয়ার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনি। রাস্তায় পাহারা নিযুক্ত করা হয় যেন মানুষকে বাঁধা দেয়া যেতে পারে। রাস্তায় পাথর স্তুপ করে রাখা হয়, যারা বিরত হবে না তাদেরকে পাথর মারা হবে। এরপর জলসাগাহ্‌ থেকেও মানুষকে ধরে ধরে নিয়ে যেত যেন তারা বক্তৃতা না শোনে। হযরত মুসলেহ্‌ মওউদ (রা.) বলেন, একজন বিটি সাহেব ছিলেন, তিনি তখন শিয়ালকোটের সিটি ইন্সপেক্টর ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি পুলিশের সুপারিন্টেডেন্টও নিযুক্ত হন, তিনি সেখানে ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন। নিরাপত্তার দায়িত্ব বা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তার ওপর ছিল। তিনি বলেন, মানুষ যখন অনেক হৈচৈ করে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে তখন এই বিটি সাহেব বা পুলিশ ইন্সপেক্টরও যেহেতু মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর বক্তৃতা শুনেছিলেন। তিনি আশ্চর্য হন, এই বক্তৃতায় কেবল খ্রিষ্টান এবং আর্যদের ওপর আক্রমন করা হয়েছে। আর মির্যা সাহেব যা কিছু বলেছেন তা যদি মৌলভীদের ধ্যান-ধারণার পরিপন্থীও হয় তবুও এর ফলে ইসলামের ওপর কোন আপত্তি বর্তায় না আর এ কথাগুলো যদি সত্য হয় তাহলে ইসলামের সত্য হওয়া প্রমাণিত হয়। প্রশ্ন হলো, এরপরও মুসলমানদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ কি? তিনি (রা.) বলেন, এই ব্যক্তি যদিও সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন, কিন্তু তিনি জলসাস্থলে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, ইনিতো (মীর্যা সাহেব) বলছেন, খ্রিষ্টানদের খোদা মারা গেছেন, হে মুসলমানগণ! একথা শুনে তোমরা কেন রাগ করছো?

হযরত মৌলভী বোরহান উদ্দীন সাহেব নামে হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান সাহাবী ছিলেন। তার সম্পর্কে তিনি (রা.) বলেন, আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে তিনি ওহাবীদের প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। তাদের মাঝে তিনি বড়ই সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পর যদিও তার জীবিকা সংকীর্ণ হয়ে যায় কিন্তু তিনি ভ্রুক্ষেপ করেন নি এবং দারিদ্র্যের মাঝেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। তিনি পরবিমুখ এক ব্যক্তি ছিলেন। তাকে দেখে কেউ বুঝতে পারত না যে, ইনি একজন আলেম বরং বাহ্যত মানুষ এটি-ই মনে করতো যে, ইনি শ্রমজীবি একজন সাধারণ

মানুষ। অত্যন্ত বিনয়ী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তার একটি কৌতুক আমার সবসময় মনে পড়ে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন শিয়ালকোট যান সেখানে তার চরম বিরোধিতা হয়। এরপর তিনি ফিরে এলে বিরোধীরা যার সম্পর্কে জানতে পেরেছে যে, এ ব্যক্তি আহমদী তাকে তারা ভয়াবহ কষ্ট দেয়া আরম্ভ করে। মৌলভী বোরহান উদ্দীন সাহেবও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে ট্রেনে তুলে দিয়ে স্টেশন থেকে ফেরত যাচ্ছিলেন। মানুষ গোবর উঠিয়ে তার ওপর ছুড়তে থাকে। এমনকি এক ব্যক্তি তাঁর মুখে গোবর ঢুকিয়ে দেয়। তিনি স্বানন্দে এই কষ্ট সহ্য করতে থাকেন। যখনই তাঁকে লক্ষ্য করে গোবর ছোড়া হত তিনি আনন্দের সাথে বলতেন, এই দিন আর এই সৌভাগ্য এত সহজে ভাগ্যে জোটে না। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, তিনি বিন্দুমাত্র ভ্রুকুঞ্চিত করতেন না। এই ঘটনার বিভিন্ন সংস্করণ রয়েছে। যাহোক, মূল শব্দ এটি না হলেও মোদ্দা কথা হলো, তিনি এতে আনন্দ প্রকাশ করেন। আদৌ তিনি ভ্রুকুঞ্চিত করেন নি বরং ভাবেন, বিরোধিতার কারণে আমি যেই কষ্টের সম্মুখীন এটিও খোদা তা'লার ফযল। তিনি অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ এক আহমদী ছিলেন। আহমদীয়াত গ্রহণের কারণ হিসেবে এক অদ্ভুত ঘটনা তিনি শোনাতেন। যদিও তিনি আহমদীয়াত কিছুকাল পরে গ্রহণ করেছেন কিন্তু দাবীর অনেক পূর্বেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে সত্য মহাপুরুষ হিসেবে শনাক্ত করেছেন। মাঝে কিছু বিলম্ব হয়। তিনি প্রথমদিকে যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা শোনেন, পদব্রজে কাদিয়ান আসেন। এখানে এসে জানতে পারেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) গুরুদাসপুর গিয়েছেন। হয়তো কোন মামলায় হাজিরা দেয়ার ছিল বা অন্য কোন কারণ ছিল, আমার সঠিক মনে নেই। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে গুরুদাসপুর পৌঁছেন। সেখানে হযরত হাফিয হামেদ আলী মরহুমের সাথে তার সাক্ষাত হয়। তিনিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একজন প্রবীন খাদেম ছিলেন আর দাবীর পূর্ব থেকেই তিনি তাঁর সাথে থাকতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নীচের ঘরে বা অন্য কোন জায়গায় অবস্থান করছিলেন। যে কক্ষে তিনি অবস্থান করছিলেন সেই কক্ষের দরজায় ছিল ছোট পর্দা। মৌলভী বোরহান উদ্দীন সাহেবের জিজ্ঞেস করার পর হাফিয হামেদ আলী সাহেব বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ কক্ষে কাজ করছেন। মৌলভী বোরহান উদ্দীন সাহেব বলেন, আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে চাই। হাফিয সাহেব বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ব্যস্ততার কারণে বারণ করেছেন আর নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, তাকে যেন ডাকা না হয়। মৌলভী সাহেব কাকুতি-মিনতির সাথে বলেন, কোনভাবে আমার সাক্ষাত করিয়ে দাও। কিন্তু হাফিয সাহেব বলেন, আমি কীভাবে তাঁকে বলতে পারি যখন কিনা তিনি নিজেই সাক্ষাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন? অবশেষে অনেক অনুনয়-বিনয়ের পরে তিনি হাফিয সাহেবের কাছ থেকে পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখার বা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যিয়ারতের অনুমতি নেন বা হাফেয সাহেবের দৃষ্টি

এড়িয়ে তিনি মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখেন। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার বিস্তারিত ঘটনা মনে নেই। তিনি সেই কক্ষের দিকে যান যে কক্ষে মসীহ্ মওউদ (আ.) ছিলেন। পর্দা উঠিয়ে উঁকি মেরে দেখেন। তিনি দেখতে পান, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পায়চারী করছেন। তখন তার পিঠ ছিল দরজার দিকে আর খুব দ্রুত বিপরীত দিকের দেয়াল-অভিমুখে যাচ্ছেন। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রীতি ছিল, যখন তিনি কোন বই, বিজ্ঞাপন বা প্রবন্ধ লিখতেন প্রায় সময় হাটতে হাটতে লিখতেন এবং ক্ষীণ স্বরে ধীরে ধীরে তা পাঠও করতেন। তখনও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কোন প্রবন্ধ লিখছিলেন আর খুব দ্রুত হাটছিলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে তা পাঠও করছিলেন। দেয়ালের কাছে পৌঁছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন ফিরতে যাচ্ছিলেন, মৌলভী বোরহান উদ্দীন সাহেব বলেন, আমি সেখান থেকে দ্রুত এই আশংকায় ফিরে আসি— পাছে তিনি আমাকে দেখে না ফেলেন। হযরত হাফিয হামেদ আলী সাহেব বা অন্য কেউ জিজ্ঞেস করেন, কি হয়েছে? মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যিয়ারত করেছেন কি? তিনি বলেন, আমি বুঝে গেছি। পাঞ্জাবীতে বলেন, যে ব্যক্তি ঘরের মধ্যেই এত দ্রুত হাটে তাঁকে কোন সুদূরের গন্তব্যেই পৌঁছতে হবে অর্থাৎ যে কামরায় এত দ্রুত হাটে, মনে হয় যেন তাঁর গন্তব্য অনেক দূরে। তখনই তার হৃদয়ে একথা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, ইনি পৃথিবীতে কোন মহান কাজ করবেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এটি একটি নিগূঢ় তত্ত্ব, একটি গূঢ় কথা কিন্তু শুধু তার পক্ষেই দেখা সম্ভব যার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি রয়েছে। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কোন কথা না বলেই সেদিন ফিরে যান। কিন্তু তার হৃদয়ে যেহেতু এই কথা বদ্ধমূল হয়ে যায় তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দাবী করেন তখন আল্লাহ্ তা'লা তাকে আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক দেন। এরপর এতটা নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতায় তাকে সমৃদ্ধ করেন যে, কোন বিরোধিতার প্রতি তিনি ভ্রুক্ষেপ-ই করেন নি।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, দ্রুত কাজ করলে সময়ের সাশ্রয় হয়। তিনি বলেন, তাই সন্তানদের দ্রুত কাজ করার এবং দ্রুত চিন্তা করতে অভ্যস্ত করা উচিত। কিন্তু দ্রুত বলতে তড়িঘড়ি বা তাড়াহুড়া করে কাজ করা নয় বরং চিন্তা-ভাবনা করে তাড়াতাড়ি কাজ করা। শয়তানই ত্বরাপরায়ণ হয়ে থাকে। কিন্তু ভেবেচিন্তে তাড়াতাড়ি যে কাজ করে সে আল্লাহ্ তা'লার সিপাহী বা সৈন্য হয়ে থাকে। অনেকের মাঝে এই আলস্য দানা বাঁধে যে, এখন আরাম করি পরে কাজ সেরে নেব। এমনটি করলে কাজ সবসময় বিলম্বিত হয়। তাই শুধু ছোটদেরই বিষয় নয়, যারা বয়স্ক, যারা ওহ্দাদার বা পদাধিকারী তাদেরও কাজে গতি সঞ্চার করা উচিত কেননা, আমরা সেই মসীহ্র অনুসারী যিনি সময়ের সদ্ব্যবহার করেছেন গভীর মূল্যায়নের চেতনা নিয়ে বরং

আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ইলহামে জানিয়েছেন, তাঁর সময় নষ্ট করা হবে না। তাই আমাদের এদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আমি দেখেছি, তিনি সারাদিন ঘরে কাজ করতেন কিন্তু দৈনিক একবার অবশ্যই পদভ্রমণে বের হতেন। কাজ বলতে তার রচনা, বক্তৃতা, সাক্ষাত সবই বুঝায় কিন্তু ভ্রমণের জন্য অবশ্যই বের হতেন। সত্তর-পচাত্তর বছর বয়স হওয়া স্বত্ত্বেও তিনি রীতিমত পদভ্রমণে বের হতেন। বয়সের কথা তিনি এখানে আনুমানিক বলেছেন। এটি নিয়ে বিতর্কের প্রয়োজন নেই। অনেকের অভ্যাস থাকে, এখানে রেফারেন্স শুনেছে তাই বিতর্ক শুরু করে দেবে, বয়স ৭৩ ছিল না-কি ৭৪ বা ৭৫। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এখানে আনুমানিকভাবে বয়সের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, বয়স এত বেশি হওয়া সত্ত্বেও ভ্রমণের বিষয়ে তিনি এত নিয়মিত ছিলেন যে, আজ আমাদের দ্বারা তা সম্ভব হয় না। আমরা অনেক সময় ভ্রমণে যেতে পারি না। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অবশ্যই পদভ্রমণে বের হতেন। তিনি বলেন, উন্মুক্ত বাতাসে চলাফেরা, উন্মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া মস্তিষ্কের জন্য উপকারী হয়ে থাকে। তাহরীকে জাদীদের বোর্ডার্সদের তিনি নসীহত করছেন, উন্মুক্ত বাতাসে থেকে শ্রমসাধ্য কাজ করলে যেখানে তাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে সেখানে তাদের মস্তিষ্কও উর্বর হবে। তারা পৃথিবীর জন্য কল্যাণকর সত্তায় পরিণত হবে। তাই আজকাল খোলা মাঠে, উন্মুক্ত বাতাসে খেলাধুলা করার প্রতি শিশু-কিশোর ও যুবকদের বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়া উচিত এবং বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণেরও প্রয়োজন রয়েছে। আর বিশেষভাবে জামেয়ার ছাত্রদের জন্য অন্ততঃপক্ষে দৈনিক দেড় ঘন্টা বাইরে খেলাধুলা করা আবশ্যিক জ্ঞান করা উচিত। আজকাল টেলিভিশনের সাথে সম্পর্কযুক্ত খেলাধুলা বাইরের শরীরচর্চা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছে। যদি কোন বাধ্য-বাধকতা না থাকে তাহলে ভ্রমণ এবং খেলাধুলা আবশ্যক হওয়া উচিত।

মৃত্যুকে যারা ভয় করে তাদেরকেই শত্রু ভয় দেখায়, এই বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জেহ্লামের মৌলভী বোরহান উদ্দীন সাহেব সংক্রান্ত ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন শিয়ালকোট যান মৌলভীরা ফতওয়া দিয়ে রেখেছিল, যে ব্যক্তি মির্যা সাহেবের কাছে যাবে বা তাঁর বক্তৃতায় উপস্থিত থাকবে তার তালাক হয়ে যাবে, বিয়ে ভেঙ্গে যাবে। ইনি কাফির এবং দাজ্জাল। তার সাথে কথা বলা, তার কথা শোনা, তার বই-পুস্তক পড়া সম্পূর্ণভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ। বরং তাকে মারা এবং হত্যা করা পুণ্যের কাজ। মৌলভীদের এ কথাগুলো নতুন কোন কথা নয়। এগুলো চিরাচরিতভাবে চলে আসছে। কিন্তু তাঁর উপস্থিতিতে তারা নৈরাজ্য সৃষ্টির ধৃষ্টতা দেখায় নি। কেননা সেখানে পুলিশের পাহারাও ছিল। সরকারী কর্মকর্তারাও ছিল আর মানুষের উপস্থিতিও অনেক

বেশি ছিল তাই তখন তারা বিশৃঙ্খলা বা নৈরাজ্য সৃষ্টির ধৃষ্টতা দেখায় নি। চতুর্দিকে আহমদীরা সমবেত ছিল। তারা পরস্পর এই ষড়যন্ত্র আঁটে যে, মির্যা সাহেবের যাওয়ার পর নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমিও তখন তাঁর (আ.) সাথেই ছিলাম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন সেখান থেকে যাত্রা করেন আর গাড়িতে আরোহণ করেন, বহুদূর পর্যন্ত মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল এবং তারা পাথর ছুড়তে আরম্ভ করে কিন্তু চলন্ত গাড়িতে পাথর লাগা সম্ভব ছিল না। কদাচিৎই আমাদের গাড়িতে কোন পাথর লাগে তারা আমাদেরকে লক্ষ্য করেই পাথর ছুড়ত কিন্তু তাদের নিজেদেরই কারো গায়ে গিয়ে লাগত। তাই তাদের এই ষড়যন্ত্র সফল হয়নি। বাকি আহমদী, যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কারণে সেখানে সমবেত হয়েছিল, তাদের কিছু আশ-পাশের গ্রামের অধিবাসী ছিল যারা তার ফিরে যাওয়ার পর এদিক-সেদিক চলে যান। স্বল্প সংখ্যক কিছু স্থানীয় আহমদী বা বাহির থেকে আগত অতিথি যারা ছিলেন তাদের ওপর বিরোধীরা স্টেশনেই হামলা আরম্ভ করে। তাদের মাঝে যাদের ওপর হামলা হয়েছে একজন মৌলভী বোরহান উদ্দীন সাহেবও ছিলেন যার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিরোধীরা পিছু ধাওয়া করে, তাকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়ে, আজে-বাজে কথা বলে এরপর সেই ঘটনা ঘটে অর্থাৎ এক দোকানে নিয়ে গিয়ে তার মুখে গোবর পুরে দেয়া হয়। এটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রত্যক্ষদর্শী বলেন মৌলভী সাহেবের ওপর যখন এই যুলুম বা অত্যাচার হচ্ছিল মৌলভী সাহেব গালি দেয়ার পরিবর্তে বা হৈচৈ না করে বড় শান্ত-শিষ্টভাবে সানন্দে এটি বলেন যে, সুবহানাল্লাহ্ এদিন কার ভাগ্যে জোটে। এমন দিন আল্লাহ্‌র নবীদের আসার পরই ভাগ্যে জোটে। আল্লাহ্‌র বড় এহসান এবং অনুগ্রহ, যিনি আমাকে এদিন দেখিয়েছেন। তিনি বলেন, এরফলে যে ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে তাহলো, স্বল্পক্ষণের মধ্যেই যারা হামলা করছিল তাদের হৃদয় তাদের ধিক্কার দেয়। তারা লজ্জা ও অসম্মানের কারণে তাকে ছেড়ে সেখান থেকে চলে যায়। আসল কথা হলো, শত্রু যখন দেখে যে, এরা মৃত্যুকে ভয় করে তখন তারা বলে যে, আস এদেরকে ভয় দেখাই। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বলেন যে, শয়তান তার বন্ধুদেরকেই ভয় দেখায়।

অতএব, যে ব্যক্তি ভয় করে তখন শত্রু মনে করে যে, এ শয়তান প্রকৃতির মানুষ কিন্তু মানুষ যদি ভয় না পায় বরং এ সকল হামলা এবং কষ্টকে আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কার মনে করে আর বলে, আল্লাহ্ স্বীয় অপার অনুগ্রহে আমকে এই সম্মানজনক পদমর্যাদা দিয়েছেন এবং তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন বলেই তাঁর খাতিরে আমি মার খাচ্ছি, তখন শত্রুর হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার হয় আর অবশেষে সে লজ্জিত হয়।

মৌলভী বোরহান উদ্দীন সাহেবের প্রেক্ষাপটে আরো একটি ঘটনা রয়েছে। মৌলভী বোরহান উদ্দীন সাহেব যেমনটি বলা হয়েছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বড়ই নিষ্ঠাবান সাহাবী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত রুচিশীল এবং হাস্যরসে ভরপুর ব্যক্তিত্ব

ছিলেন। তাঁর এবং মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব মরহুমের ইন্তেকালের কারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে মাদ্রাসায়ে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠার ধারণা জাগ্রত হয় যা পরে জামেয়া আহমদীয়াতে পরিবর্তিত হয়। তিনি বলেন, একবার তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আসেন এবং বলেন, আমি স্বপ্নে আমার প্রয়াত বোনকে দেখেছি। তার সাক্ষাতে আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছি যে, বোন! বল দেখি পরকালে তোমার কেমন কাটছে? আমার বোন বলে, আল্লাহ্ তা'লা খুবই অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাকে তিনি ক্ষমা করেছেন। জান্নাতে আমি আরামে জীবন যাপন করছি। আমি জিজ্ঞেস করি, বোন! সেখানে তোমার সময় কীভাবে কাটে? এটিও একটি কৌতুক বটে। তিনি বলেন, সেখানে আমি কুল বা বরই বিক্রি করি। মৌলভী বোরহান উদ্দীন সাহেব বলেন, আমি স্বপ্নে বোনকে বললাম, বোন! আমাদের ভাগ্য খুবই অদ্ভুত, জান্নাতেও আমাদেরকে কুলই বিক্রি করতে হবে? যেহেতু তার পরিবার দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত ছিল তাই স্বপ্নেও তার ধারণা এদিকেই যায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এই স্বপ্ন শোনানো হলে তিনি বলেন, মৌলভী সাহেব! এ স্বপ্নের তা'বীর ভিন্ন। কিন্তু স্বপ্নেও আপনি রসিকতা করতে ভুললেন না। তিনি রসিকতায় অভ্যস্ত ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, কুল সত্যিকার অর্থে জান্নাতের ফল। এর অর্থ হলো, এমন কামেল এবং নিঁখুত ভালবাসা যা অম্লান ও অমলিন। সিদরাহ্ অম্লান ও অমর ঐশী ভালবাসার স্থল। কাজেই, এর ব্যাখ্যা হলো, আমি খোদার অনন্ত ভালবাসা মানুষের মাঝে বিতরণ করি। বোনের স্বপ্নের অর্থ এটিই। তিনি ব্যাখ্যায় আরো বলেন, মু'মিন যে স্থানেই থাকুক না কেন তাকে কাজ করে যেতে হবে। এমন নয় যে, মৃত্যুর পর জান্নাতে চলে যাবে আর সেখানে শুধু বিশ্রাম আর বিশ্রাম-ই থাকবে, বরং কাজ করতে হবে যেভাবে তার বোন ভাইকে কাজের কথা জানিয়েছেন। যদি কারো মাথায় কখনও এমন ধারণা জন্মে যে, এখন বিশ্রামের সময় তাহলে এর অর্থ হলো, সে নিজের ঈমান হারাতে বসেছে কেননা ইসলাম যে বিষয়কে ঈমান এবং আরাম আখ্যায়িত করেছে তাহলো কাজ করা। আল্লাহ্ তা'লা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, "ফাইযা ফারাগ্তা ফানসাব ওয়া ইলা রাব্বিকা ফারগাব"। যখন কাজ থেকে ফারেগ হও আরও বেশি পরিশ্রম কর এবং তোমার প্রভুর পানে ধাবিত হও। এটি একটি গূঢ় কথা যা সব সময় স্মরণ রাখা উচিত। পৃথিবীর মানুষ যাকে আরাম আখ্যায়িত করে সেই অর্থে তোমাদের জন্য কোন আরাম বা বিশ্রাম নেই কিন্তু কুরআন যেই অর্থে আরাম বা বিশ্রামের প্রতিশ্রুতি দেয় তা সহজেই তোমরা হস্তগত করতে পার। পৃথিবী যে অর্থে আরাম বা বিশ্রামের অর্থ করে তা অবশ্যই ভ্রান্ত। আর এই অর্থে যে ব্যক্তি আরাম বা বিশ্রাম সন্ধান করবে সে এ পৃথিবীতেও অন্ধ থাকবে এবং পরকালেও অন্ধ হিসেবেই উত্থিত হবে।

তাই মু'মিনের কাজ হলো নিজেকে কাজে নিয়োজিত রাখা। এক লক্ষ্য অর্জনের পর দ্বিতীয় লক্ষ্য সন্ধানে সোচ্চার হয়ে যাওয়া। আর এটি-ই ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত উন্নতির ব্যবস্থাপত্র এবং রহস্য। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দিন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।